মুক্তিযুদ্ধের চেতনা–আজকের বাঙলাদেশ।

মোহাম্মদ জানে আলম*

ঐশ্বর্যই ছিল বাঙলার ঐতিহ্য।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল --বাঙালির স্বায়াত্ত্বশাসন থেকে স্বাধীকার আন্দোলন, তার চুড়ান্ত পরিণতিতে একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের রক্ত পিচ্ছিল পথে যে বাঙলাদেশের জন্ম; তার আজকের অবস্থার বিশ্লেষণ সঠিকভাবে বুঝতে হলে বাঙলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকে আমাদের একটু দৃকপাত করতে হয়।

একদা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ রূপে ও সম্পদে ছিল ঐশ্বর্যশালী । তার এ ঐশ্বর্যই যেন তার জন্য কাল হোয়ে দাঁড়াল। তার এ সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য যুগে যুগে তাকে আক্রমণ করেছে বিদেশী লুঠেরা বেনিয়ার দল। তাদের বিরুদ্ধে বাঙালিকে অহর্নিশ লড়াই সংগ্রাম করে বাঁচতে হোয়েছে। এ সম্পদের আশায় এ দেশে পর্তুগীজ এসেছে, মারাঠা এসেছে, এসেছ মৌর্য, গুপ্ত, পাল,সেন ,তুর্কী, আফগান, মোগল ও ইংরেজ। দুনিয়ার আর কোন জাতির উপর এত বিদেশী শাসক অবতীর্ণ হোয়েছিল কিনা জানিনা। সর্বশেষ ২৪ বছর পাকিস্তানী শাসনের আগে ইংরেজরা পুরো উপমহাদেশকে শাসন করেছে সুদীর্ঘ আড়াইশত বছর ধরে। ইতিহাসের এ অধ্যায় থেকে যদি আমরা শুরু করি, তাহলেও আমরা দেখতে পাব, এত বিজাতীয় শোষণের পরও আমাদের বাংলা সম্পদেও সৌন্দর্যে ছিল ঐশ্বর্যশালী। বাংলার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কারণে ইউরোপে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল--বাংলায় ঢোকার শত শত রাস্তা আছে, কিন্তু বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই। আফ্রিকার পরিব্রাজক ইবনে বতুতার কথা আমরা জানি, যিনি গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, বাংলার গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করে বাংলার এক চমৎকার ঐশ্বর্যময় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট শাহজানের রাজত্বকালে ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার এসেছিলেন ভারত বর্ষে। বাংলার ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হোয়ে তিনি ফরাসী প্রধানমন্ত্রী কোলবার্টকে লিখেছিলেন--প্রতি যুগে মিশরকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী ও ফলশালী দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হোয়েছে, কিন্তু দু'বার বাঙলা নামক রাজ্যটি পরিভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতা আমার হোয়েছে, তাতে মনে হয় এ সম্মান বাঙলার প্রাপ্য। আর দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার বাংলার রূপ দেখে বিস্ময়ে তার সেনাপতিকে বলেছিলেন, সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ! এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, তা হলো প্রাচীনকালে এ দেশের গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । স্যার চার্লস মেটাকাফি এর নাম দিয়েছিলেন 'ভিলেজ রিপাবলিক' । সেই সুদুর অতীত থেকে জনগণের মাঝ থেকে গড়ে ওঠা গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ণমাত্রায় স্বশাসিত ছিল। কিন্তু দেশীয় ধারণা বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্রিটিশ আমলে ১৮৮৫ ইং সালে বঙ্গীয় স্থানীয় সরকার আইন পাশ করা হয়। এতে জেলায় জেলা বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু এগুলো ছিল কেন্দ্র থেকে আরোপিত কেন্দ্রনির্ভর এবং আমলাতন্ত্রের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

মধ্যযুগের ইউরোপে কিংবদন্তীর এ দেশ আজ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ। কিন্তু কেন?

তার প্রধান কারণ-- শত শত বৎসর ব্যাপি বিদেশী ঔপনিবেশিক শোষণ বাংলার ঐশ্বর্যকে তিলে তিলে চুষে নিয়েছে। শুধু বাঙলা নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর পশ্চাৎপদতার মূলে কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। একটি মাত্র তথ্য থেকে আমরা ভারতে বিদেশী শোষণের এ ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারি। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮১৫ সাল, পলাশীর যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাত্র ৫৮ বছরে উইলিয়াম ডিগবির হিসাব অনুসারে ইংরেজরা প্রায় পাঁচ শ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পুঁজি ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যায়; আর এর সিংহভাগ জোগান দিয়েছিল বাঙলা। এভাবে আড়াই শ' বছরে তারা কত সম্পদ এদেশ থেকে নিয়ে গেছে তা অনুমান করাও কষ্টকর। এ গেল প্রাক-বৃটিশ আমলে বাঙলার ঐশ্বর্যের কথা।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে বাংলার সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল?

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বৃটিশ শাসনের পূর্বে বাঙলায় ধর্মসাম্প্রদায়িকতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। বরং দেখা যায় মোগল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু,মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার বার ভূঁইয়া চাঁদ রায়, কেদার রায় থেকে শুরু করে ঈশা খাঁ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

নবাব সিরাজউদদৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন যে দু'জন সেনাপতি--মীর জাফর ও মীর কাশেম--তারা দু'জনই ছিলেন মুসলমান। আর হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল তার মুসলিম সহকর্মী মীর মর্দান এর সাথে লড়াই করে জীবন দিয়েছিলেন নবাবের জন্য। তীতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ, সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে বাঙ্গালির সম্মিলিত সংগ্রাম। কিন্তু বৃটিশ শাসকদের আনুকুল্যে প্রথমে হিন্দু এলিট ও পরে মুসলিম এলিট শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ ঘটে। শাসক ইংরেজদের আশ্রিত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর নিরন্তর শোষণের ফলে মুসলিম মানসে হিন্দু বিদ্বেষ দানা বাঁধে--ফলতঃ অর্থনৈতিক শোষণের শ্রেণীগত প্রেক্ষিত চাপা পড়ে যায় ধর্ম-সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের আড়ালে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ

মানসিক বিভ্রান্তির সুযোগ পুরোদমে গ্রহণ করে সুচতুর জিন্নাহ তার দ্বি-জাতি তত্ত্ব হাজির করলে দরিদ্র ও বিকাশমান মধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরিশেষে সে দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান। বৃটিশ বেনিয়ার শোষণের বরকন্দাজ হিন্দু জমিদার তালুকদার, চৌধুরী ভূঁইয়াদের সরাসরি শোষণ নিপীড়নে অতিষ্ট বাঙ্গালী মুসলমানদের মানসভূমিতেও এ ধারনা দানা বাঁধল যে, শুধু বৃটিশ শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পেলে বাঙ্গালীর মুক্তি ঘটবেনা, মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন আলাদা স্বাধীন ভূমি, তা নাহলে হিন্দু শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবেনা। এ বিশ্বাস থেকেই সেদিন এতদাঞ্চলের মুসলমান বঙালিরা দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর সমর্থক বনে গিয়েছিল।

<u>বাঙালির মোহভঙ্গঃ ধর্মীয় জাতীয়তা থেকে নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদে উত্তরণ</u>

সদ্যস্বাধীন পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পুর্ব বাংলার মানুষদের রাজনৈতিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী শাসনের যাঁতাকলে আবদ্ধ করার মানষে প্রথম আঘাত হানতে চাইল বাঙ্গালী সংস্কৃতির উপর। সে লক্ষ্যে তারা সর্বপ্রথম আঘাত হানল বাংলা ভাষার উপর। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হলেও তারা উর্দুকেই করতে চাইল রাষ্ট্র ভাষা। পাকিস্তানের জনক মোঃ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালেই ঘোষনা করলেন--উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। লক্ষ্য পরিস্কার--বাঙ্গালীকে স্থায়ী ভাবে শাসন-শোষণ করা। প্রতিবাদে গর্জে উঠল সেদিনের বাঙ্গালী তরুণ ছাত্র সমাজ। বাঙ্গালীদের তীব্র প্রতিবাদে পাকিস্তানীরা সাময়িকভাবে পিছু হঠলেও জিন্নাহের সে ঘোষণার রেশ ধরে ৫২ সালে আবারো ঘোষণা আসল উর্দ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা । পশ্চিমাদের এ চক্রান্ত ষড়যেন্ত্রর বিরুদ্ধেই ৫২ এর ভাষা আন্দোলন। সালাম, জব্বার রফিক শফিকদের রক্ত দান। বস্তুতঃ তাদের রক্তেই সেদিন অঙ্কুরিত হলো বাঙ্গালী জাতীয়বাদী চেতনার। বাঙালি চেতনার এখানে একটি গুণগত উল্লম্ফন ঘটল--মুসলিম জাতীয়তাবোধ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবোধ। ৫৪ এর যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বিকশিত হোয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার সে রক্তবীজ '৬৯ এ গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পশ্চিমা শাসক শ্রেণীর অন্যতম প্রতিভূ দোর্দণ্ড প্রতাপে দশকাধিক কালব্যাপী শাসনকারী জেনারেল আয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেই শাসক গোষ্ঠীরই নোতুন প্রতিভূ জেনারেল ইয়াহীয়া সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হলেন ৭০ সালে এসে। সে নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ বাঙ্গালী ৬ দফার পক্ষে আওয়ামী লীগকে ভোট প্রদান করে জাতীয় ঐক্যের চরম অভিব্যক্তি ঘটায়। সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নোতুন করে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত শুরু করে। বাঙ্গালীকে তারা ক্ষমতা দেবেনা। পরিশেষে একাত্তরের ২৫ শে মার্চ বাঙ্গালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। প্রতিরোধ–প্রত্যাঘাত সৃষ্টি করে নিরস্ত্র বাঙ্গালী। দীর্ঘ নয় মাসের অসম যুদ্ধ। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পূর্বে বাঙালি জতি-- যাদের একদা ভেতো বাঙালি–ভীরু বাঙালি বলে বিদ্রুপ করা হতো--তারা সশস্ত্র লড়াইয়ে বিশ্বের একটি নিয়মিত চৌকস সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে পরাস্ত করেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে। সে বিজয়ের মাধ্যমেই বস্তুতঃ বাঙালি ছিনিয়ে আনল তাদের স্বাধীনতা--যার ঘোষণা প্রদান করা হোয়েছিল সে বছরের ২৬ শে র্মাচ। সে অভূতপূর্ব বিজয়ের মাধ্যমে সেদিন বিশ্বের মানচিত্রে কেবল নোতুন একটি দেশের নাম সংযোজিত হলনা, হাজার বছরের ঐতিহ্য সম্পন্ন বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি 'নেশন' হিসাবে পূণঃজন্ম হলো। বাঙালি জনগোষ্ঠী তার হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম একটি জাতিরাষ্ট্র পেল--যার নাম হলো বাঙলাদেশ। আর্য-দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক জাতির সংমিশ্রনে একটি শংকর নৃ-গোষ্ঠী বিবর্ততি হোয়ে যেমন পরিণত হলো বাঙালি জাতিতে, একই সময়কালে পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম,বরেন্দ্রী, হরিকেল, সমতট, বঙ্গ--প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড জনপদের রাজনৈতিক রূপান্তর হোয়ে জন্ম হলো আজকের বাঙলাদেশ। বাঙালি জাতি নোতুন ভাবে স্বপ্ন দেখল--একটি ধর্মনিরপেক্ষ--গণতান্ত্রিক ও সুখী-সমৃদ্ধশালী আধুনিক রাষ্ট্রের।

<u>মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঃ</u>

স্বাধিকার থেকে স্বায়াত্বশাসনের আন্দোলন--সে আন্দোলনের রক্তপিচ্ছিল সোপান বেয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ--চুড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ--এ হলো বাঙালির স্বাধীনতা ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা।

কিন্তু সে রক্তাক্ত ইতিহাসের মর্মবস্তু (Essence of the History) কি ?

এ প্রশ্নের উত্তরে মধ্যেই আমরা খুঁজে পাবো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে--ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক হলেও পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরই বাঙ্গালীরা বুঝতে পারল--পশ্চিমা 'বেরাদারানে মুসলমানেরা' বস্তুতঃ রাজনৈতিক ভাবে শাসন ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করার জন্যই ধর্মকে নিছক বর্ম হিসাবে ব্যবহার করছে। তারা এতদাঞ্চলের মানুষকে কখনো স্বধর্মীয়, এমনকি স্বরাষ্ট্রীয় বলেও মেনে নিতে পারেনি। বাঙালিদের প্রতি তাচ্ছিল্যভরা উন্নাসিকতা পশ্চিমাদের আচার-আচরণে ও কথা-বার্তায় নগ্নভাবে ফুটে ওঠত। তারা পূর্ববাংলাকে তাদের একটি স্থায়ী উপনিবেশ ও এতদাঞ্চলের

জনগোষ্ঠীকে তাদের সেবাদাসে পরিণত করতে চেয়েছিল। ধর্মীয় ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যখন ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর শোষণ চালাল--তখন এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর বোধোদয় হলো যে--একই ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি মানুষকে তত কাছে টানেনা, যত কাছে টানে তার ভাষা ও সংস্কৃতি। এ বোধ থেকেই নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী তখন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল--পশ্চিমা ভিন্ন ভাষী মুসলমান ভাইয়েরা তাদেরকে একই ধর্মের মুসলমান ভাইয়ের পরিবর্তে ভিন্ন ভাষী ভিন্ জাতি হিসাবেই বেশী বিবেচনা করছে। বস্তুতঃ ধর্মীয় জাতীয়তার ব্যাপারে তখনই তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। যেদিন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা করল, সেদিন থেকেই বাঙালি হৃদয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার উম্মেষ ঘটতে থাকে। বাঙালিরা বুঝতে পারল--ধর্মভিত্তিক জাতি নয়, বাঙালি জাতি হিসাবে স্বকীয় পরিচয়ে তাদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে। বাঙলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে নোতুন করে বিতর্ক উঠল আমরা বাঙ্গালী না মুসলমান। ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন কি আমাদের সংস্কৃতি হবে--নাকি আবহমান কালের বিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাথে গড়ে ওঠা লোকজ দেশাচার হবে আমাদের সংস্কৃতি। তখন পশ্চিমা মুসলমান ভাইদের রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী ঐক্যবদ্ধ হলো--জাগো জাগো-- বাঙ্গালী জাগো--শ্লোগান তুলে। তোমার আমার ঠিকানা--পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তুমি কে আমি কে--বাঙ্গালী বাঙ্গালী, প্রভৃতি শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী জেগে উঠল প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে। বলা বাহুল্য, মুষ্ঠিমেয় বাঙ্গালী ছাড়া পুরো জাতি এচেতনায় শুধু উজ্জীবিত ছিলনা, বিক্ষোভে বিদ্রোহে ছিল উদ্বেলিত। এ চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েই বাঙ্গালী নয় মাসের সশ্বস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তানীদের পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনল।

অতএব বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদই হলো আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের মূল প্রেরণা।

এ জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যেই নিহিত আছে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বিকশিত নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ বস্তুনিষ্টভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ। কারণ এ পরিচয়ের ক্ষেত্রে ধর্ম কোন ভূমিকা রাখেনা--হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সব ধর্মের লোক মিলিয়েই বাঙালি নৃ-গোষ্ঠী।

ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অর্জিত স্বাধীনতার পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত শোষনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়ভাবে প্রতিরোধের স্পৃহাই জাতীয়তাবাদী চেতনার উম্মেষ ঘটায়।

অতএব, শোষন থেকে মুক্তি তথা শোষনহীন সমাজ বিনির্মাণই মুক্তিযুদ্ধের মৌল অনুপ্রেরণা--তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সমাজতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হোয়েছিল।

বৃহত্তর পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বাঙ্গালীর স্বায়াত্বশাসন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন ছিল মর্মগতভাবে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠির শোষণ-শাসনের নাগপাশ থেকে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ফলতঃ মর্মগতভাবেই এ আন্দোলন ছিল গণতান্ত্রিক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি--আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা চেতনা ও মূল্যবোধগুলোই আমাদের স্বাধীনতার চেতনা হিসাবে বিকশিত হয়ে --গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা-জাতীয়তাবাদ-প্রভৃতি চার মূলনীতি হিসাবে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানে গৃহীত হোয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো--স্বাধীনতার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের সে চেতনা বা মূল্যবোধের কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি ? একটি শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে আমাদের সমাজের বিদ্যমান চিত্রটি কি ?

<u>আজকের বাঙলাদেশঃ স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা।</u>

<u>আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত।</u>

স্বাধীনতার মূল স্বপ্ন ছিল একটি শোষণহীন সমাজ। স্বাধীনতার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর সে কাঙ্খিত শোষণহীন সমাজ কি আমরা পেয়েছি? ভৌগোলিক স্বাধীনতার মাধ্যমে বিশেষ জাতির শোষণ থেকে মুক্তি পেলেও নয়াঔপনিবেশিক শোষণে শৃঙ্খলে বাঁধা আজ আমাদের অর্থনীতি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন ঋণখেলাপি-কালটাকার মালিক--একটি মাফিয়া চক্র--আজ নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের রাজনীতি। অর্থনীতির চাবিকাঠিও তাদের হাতে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আজ রাজনীতি হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনভাবে ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা ক্ষমতায় থাকা। সৎ-দেশপ্রেমিক মেধাবী মানুষেরা আজ রাজনীতি থেকে নির্বাসিত। সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের অধিকাংশ বেনিয়া-ঋণ খেলাপী। রাজনীতি তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা। অপশাসন- দুঃশাসনে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠেছে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য আজ চরম আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরেও আমাদের দেশে যেমন একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

বিকশিত হয়নি, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানেও ধারাবাহিকভাবে শাসনকারী দলগুলোর চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে উন্নয়নের অব্যর্থ মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হলেও বস্তুতঃ দেশে কাঙ্খিত শিল্পায়ন ঘটেনি। ফলতঃ সমাজে যেমন শ্রেণী বৈষম্য তীব্র হোয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন এক শ্রেণীর শহুরে লুঠেরা ধনিকদের সীমাহীন জৌলুস–আধুনিক জীবন যাপন–আর অন্যদিকে গ্রামের বিশাল দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রাণান্তকর আদি সংগ্রাম–এ স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন সমাজ কখনো স্থিতিশীল হতে পারেনা। বেকারের সংখ্যা তিন কোটির উপরে। ফি বছর ২১/২২ লক্ষ শিক্ষিত বেকার শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে পুরো সমাজকে গিলে ফেলেছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের কলঙ্ক তিলক আমাদের মাতৃভূমির ভালে শোভা পাচ্ছে বিগত চার বছর ধরে। স্বাধীনতার পর হতে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ব্যর্থতার ফলশ্রূতিতে আজ গ্রামীণ ও শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র যুবশ্রেণীর মনে যে হতাশা দানা বেঁধেছে।

<u>মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত ও জঙ্গীবাদের উত্থান ঃ</u>

উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর নিরন্তর প্রচারণা-প্ররোচনা, বিশেষভাবে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার, রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, সর্বোপরী বর্তমান জোট সরকারের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা––সবমিলিয়ে দেশে মৌলবাদী রাজনীতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলেছে। ফলশ্রুতিতে মৌলবাদ জঙ্গীরূপ ধারণ করে দেশের স্বাধীনতাকেই আজ হুমকীর মুখোমুখী করে তুলেছে।

<u>আত্ম পরিচয়ের সংকট ঃ</u>

এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদী চেতনা ভিত্তিতেই আমরা সেদিন স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জন্ম ও বিকাশগতভাবে আমরা বাঙ্গালী, এটা আমাদের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়। এ আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর আজ আমাদের সে পরিচয় নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে––আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী। দেশের এক বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠি আজ তাদের আত্মপরিচয় নিয়ে বিভ্রান্ত।

<u>ধর্মনিরপেক্ষতাঃ</u>

নৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ কখনো ধর্মভিত্তিক হতে পারেনা। কারণ একই নৃ-গোষ্ঠীর সকল জনগোষ্ঠী একই ধর্মের অনুসারী হয়না। স্মর্তব্য যে, বিশ্বে ধর্মের সংখ্যা ১০০৯টি, কিন্তু জাতির সংখ্যা মাত্র ১৬৩টি । অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মই আলাদা জাতি সৃষ্টি করেনি। তদ্রূপ বাঙ্গালী বলতে হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল বাঙ্গালীকেই বুঝানো হত। একাত্তুরে সে চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু সে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা আজ রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি থেকে নির্বাসিত। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কি সরকারী দল কি বিরোধী দল––তাদের দলীয় রাজনৈতিক আচরণে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার বিপরীতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ ধর্মরিপেক্ষতা ছাড়া কোন রাষ্ট্র আধুনিক হতে পারেনা, পারেনা এগিয়ে যেতে।

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে যেমন পরিবর্তন হয়েছে উৎপাদন সম্পর্কের, তেমনি নোতুন উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয় সামাজিক চেতনার। আদিম যুগে সামাজিক চেতনা বলতে রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম এসব কিছুই ছিলনা। মধ্যযুগে এসে ধর্ম প্রধান সামাজিক চেতনার স্থান দখল করে নেয়। মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে যে পুজিঁবাদী সমাজের উদ্ভব––তাতে বিজ্ঞানই সমাজের মৌল চেতনায় পরিণত হয়। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের যে পিলে চমকানো উন্নয়ন তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান এবং একমাত্র বিজ্ঞান। আধুনিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এমন কোন বিষয় নেই বিজ্ঞানের অবদানে যা আজ ঋদ্ধ নয়। আমাদের গায়ের কাপড়চোপড় হতে শুরু করে হাতের মোবইল ফোনটি পর্যন্ত এ বিজ্ঞানের অবদান। আজকে যে দেশ বা জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যত উন্নত, সে দেশ বা জাতি তত বেশী অগ্রসর। বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে যারা যত পিছিয়ে তারা তত পশ্চাদপদ। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে––আমরা কি কেবলি একটি ধর্মপ্রাণ জাতির তক্‌মা কপালে নিয়ে একটি দ্রারিদ্রক্লিষ্ট পশ্চাদপদ জাতি হিসাবে উন্নত দুনিয়ার কৃপা নিয়ে কোন রকমে ভিক্ষুকের জীবন ধারণ করে যাব––নাকি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে উন্নতশিরে বেঁচে থাকব। প্রশ্ন হতে পারে ধর্মকে মৌল চেতনা হিসাবে মেনে নিয়ে কি আধুনিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ করা যায়না? অপ্রিয় জবাব হলো না––যায়না। তবে একজন ধার্মিকের পক্ষেও বিজ্ঞানের আবিস্কারের সকল সুফল নির্বিবাদে ভোগ করা সম্ভব, যেমনটি সমকালীন ইসলামী মৌলবাদের জীবন্ত কিংবদন্তী ওসামা বিন লাদেন করে থাকেন। তার ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে শুরু করে সে ভিডিও টেপ

--যার মাধ্যমে মাঝে মধ্যে তিনি তার অনুসারীদের জন্য ঐশী বাণী প্রেরণ করেন--সবকিছুই বিজ্ঞানেরই প্রযুক্তি। সেগুলো ভোগ করতে কোন ধর্মবেত্তার কোন আপত্তি নেই। যত আপত্তি শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বটা মেনে নিতে। বিজ্ঞানের কার্য-কারণ তত্ত্ব , গবেষণা, এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপনেই তাদের যত আপত্তি। কারণ তাতে তাদের বুজরুকি শেষ হোয়ে যাবে । ক্রমে মানুষ ধর্মের নামে প্রচলিত অনেক অন্ধ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। তাই শুধু বিজ্ঞানকে নয়, সাধারণ যুক্তি তর্কে ও তারা ভয় পায়। একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি যুক্তি তর্ক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়--তাহলে আধুনিক যুগে সে রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে কিভাবে? কারণ বিশ্বাস মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করেনা। আর অনুসন্ধিৎসু না হলে মানুষের পক্ষে কখনো কিছু আবিস্কার করা সম্ভব না। নোতুন আবিস্কার কিংবা সৃষ্টি ছাড়া কোন সমাজ কখনো এগিয়ে যেতে পারেনা। আমাদের পিতামহরা যেভাবে ভাবত--আমার বাবারাও যদি সেভাবে ভেবে আসত এবং আমরাও সেভাবে ভাবতে থাকি--তাহলেতো নোতুন কিছুই কখনো সৃষ্টি হবেনা। এ অবস্থায় কোন সমাজ কিংবা সভ্যতা কখনো বিকশিত হবেনা। ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমারেখা অতিক্রম না করলে বর্তমান মানব সভ্যতাতো দু'হাজার বছর পূর্বের আদলে স্থবির হোয়ে থাকত।

গণতন্ত্রঃ

সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মর্মগতভাবেই ছিল গণতান্ত্রিক। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরও আমরা কি একটি সার্বিক অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করতে পেরেছি? গণতন্ত্র মানে যদি হয় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন, তাও আমাদের দেশে প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত কোন সরকার যদি মানুষের মৌলিক অধিকার পদদলিত করে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়, খোদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে বিনাবিচারে মানুষ মারে, দুর্নীতিতে আকন্ঠ নিমগ্ন হয়, তখন তাকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা যায়না। বস্তুতঃ সভা সমাবেশ করার অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ ইত্যাদি হলো গনতন্ত্রের প্রতিভাস (Manifestation) মাত্র । কিন্তু গণতন্ত্রের মর্ম বা সারবস্তু (Essence) হলো মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা। অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা- বাসস্থানের নিশ্চয়তা ছাড়া গণতন্ত্র কখনো টিকেনা--কার্যকর হতে পারেনা।

আধুনিক প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাঃ

আজ যে সভ্য সমাজে আমরা বসবাস করছি, তা সমাজ-সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ক্রম বিকাশের ফল। আজকের সমাজ যেখানে দাঁড়িয়েছে, আদিম সমাজের রূপ কখনো তা ছিলনা। হাজার হাজার বছরের বিকাশ-বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজের এ ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিকশিত হোয়েছে মানবগোষ্ঠির চেতনা। সমাজতত্ত্বের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, মানুষের চিন্তা চেতনার ভিত্ত হচ্ছে সামাজিক। সমাজ রূপান্তরের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা চেতনার রূপান্তর ঘটে। আজকের সমাজের মানুষদের যে চেতনা ও মূল্যবোধ, আজ থেকে বিশ বছর আগে তা ছিলনা এবং আগামী বিশ বছর পরও তা পাল্টে যাবে। এ স্বতঃসিদ্ধটা আমাদের এ কারণে মনে রাখতে হবে যে--আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সেদিন যে স্বপ্ন বা আকাঙ্খা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাড়িত করেছিল--যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল--তাই আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে প্রতিভাত। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, সমাজ বিবর্তনশীল । সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। ফলতঃ পরিবর্তন ঘটে মূল্যবোধের। সঙ্গতঃ কারনেই মানুষের স্বপ্নেরও ঘটে পরিবর্তন। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখনো কি সে স্বপ্ন নিয়ে বসে থাকব? সে স্বপ্ন কি আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে? নিশ্চয় নয়। সেদিনের স্বপ্নের সাথে আমাদের সময়ের দাবী আজকের স্বপ্নের সমন্বয় করে নিতে হবে।

বিদেশী শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেদিন আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোয়েছিলাম। আমার বাঙালিত্ব নিয়ে গর্ব করেছিলাম। কিন্তু আজকের পেক্ষাপটে বিশ্বে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের অবশ্যই আন্ত র্জাতিকতাবাদী হতে হবে। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠির স্ব স্ব সংস্কৃতি থাকা সত্বেও সমগ্র মানবগোষ্ঠি আজ একটি সাধারণ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে পুরানোকে আঁকড়ে ধরলে আমাদের পক্ষে এগুনো কোন ভাবেই সম্ভব হবেনা। আমাদের এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে--আমাদের সকল ঐতিহ্যই গৌরবের নয়। আমদের লোকজ সংস্কৃতির এমনি কিছু বিষয় আছে যা রিতীমত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যেমন আমাদের গ্রামের মানুষ একজন বদ্ধ-উম্মাদ-নগ্ন পাগলকে মুক্তিত্রাতা ভেবে তার পিছু ঘুরে বেড়ায়--মোক্ষলাভের আশায়। গ্রামের মানুষ রোগে শোকে এখনো তাবিজ-মাদুলী ব্যবহার করে। টিয়া আর বানর দিয়ে ভাগ্য গণনা করায়। এসবই আমাদের ঐতিহ্য। এসব ঐতিহ্য থেকে আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি পেতে হবে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে

যে--পুরাতন চেতনার গণ্ডী অতিক্রম না করলে নোতুন চিন্তার জন্মই হয়না। দুনিয়াতে যত আবিস্কার হোয়েছে সবই সনাতন ধ্যান ধারণা--সনাতন বিশ্বাস ভেঙ্গেই হয়েছে।

আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে প্রগতির পথে। এ এক সুকঠিন কাজ। একাত্তুরে যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করেছিল, আজকের পেক্ষাপটে কেবল তাদেরই স্বাধীনতা বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করলে হবেনা। সেদিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থেকেও যারা আজ সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-সন্ত্রাস-দুর্নীতির সাথে আপোষ করে চলে-তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে--তারাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তথা স্বাধীনতা বিরোধী। যারা কাল টাকার মালিক--লুটেরা ঋণখেলাপী -তারাও স্বাধীনতা বিরোধী। তাই এতগুলো শক্তির বিরুদ্ধে যুগপৎ লড়াইয়ে সফল হতে হলে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। এখানেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যের কথাটি সামনে চলে আসে। সকল মহল থেকেই আহবান জানানো হচ্ছে ঐক্যের। এক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের সকল পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ ইং সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হয়েছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ণমেয়াদে তারা ক্ষমতায়ও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রেক্ষিতে সমাজ প্রগতির পথে তারা কতটুকু এগুতে পেরেছে--এগুনোর চেষ্টা করেছে--তারও বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণ করতে হবে। এ বিশ্লেষণ থেকে বের হোয়ে আসবে কাঙ্খিত ঐক্যের ভিত্তি কি হবে। শুধু ঐক্যবদ্ধ হোয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে হবেনা--রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে কি করা হবে--তারও একটি আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। তা না হলে ঐক্য যেমন সুদৃঢ় হবেনা, আবার সে ঐক্যের সরকার কাঙ্খিত সমাজ বিনির্মানের জাতিকে দিক্‌নির্দেশনা দিতে পারবেনা।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কাঙ্খিত রূপরেখাই সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করবে। তাই আজ যেটা জরুরী, তাহল ঐক্যের আহবান শুধু নয়, সাথে সাথে বিদ্যমান আর্থ-সামজিক কাঠামোর বিপরীতে একটি সেক্যুলার--গণতান্ত্রিক--সন্ত্রাস, নৈরাজ্য-দুর্নীতি ও বেকারত্ব মুক্ত শোষণ-বৈষম্যহীন সুশীল সমাজের রূপরেখা তৈরী করা। একমাত্র সেটার ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠবে। এর কোন বিকল্প নেই। তখনি কেবল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, স্বাধীনতানর সঠিক ইতিহাস সুরক্ষা সম্ভব হবে।

** মোহাম্মদ জানে আলম*
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।